বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণ ঃ কিছু নৈতিক প্রশ্ন

ডঃ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান
অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী - ৬২০৫

প্রবন্ধটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ২০ তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এবং ২১-২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ, যথাক্রমে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ, কাকরাইল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী সেমিনারে উপস্থাপিত

ডিসেম্বর ২০১৭
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী

সারসংক্ষেপ

সংবিধান হচ্ছে একটি দেশ পরিচালনার সর্বোচ্চ আইন। এ আইন মেনে চলা দেশের সরকারসহ প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সরকারকে আর যাই হোক দেশপ্রেমী সরকার বা নাগরিক বলা যাবে না। আমাদের সৌভাগ্য যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ৯ মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তৎকালীন জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত একটি সুন্দর আধুনিক সংবিধান পাই। অন্যদিকে আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতার শত্রু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী চক্রান্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট আমরা জাতির জনক বঙ্গঁবন্ধুকে হারাই। সাথে সাথে তছনছ হয়ে যায় বঙ্গঁবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের আজীবন লালিত স্বপ্ন। দেশের বুকে চেপে বসে সামরিক স্বৈরাচারী দু:শাসন। সামরিক স্বৈরাচার প্রথমেই ছুরি চালায় আমাদের মহান সংবিধানের মূলনীতিগুলোর উপর। বাতিল করে দেয় বঙ্গঁবন্ধুর সরকার সূচিত দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচীসমূহ (প্রথম বিপ্লব হচ্ছে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। আর দ্বিতীয় বিপ্লব হচ্ছে ১৯৭৫ এর জানুয়ারীতে সূচীত অর্থনৈতিক বিপ্লব)। একে একে শিক্ষানীতি, শিল্পনীতিসহ বঙ্গঁবন্ধুর সরকার কর্তৃক অনুসৃত সব নীতিকৌশলই পরিত্যাগ করে স্বৈরাচারী সামরিক সরকারগুলো। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার পতনের পর ক্ষমতায় আসা সরকারগুলোও স্বৈরাচার প্রবর্তিত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশ ও তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া নীতিকৌশল অবলম্বন করে চলছে। এমন কি বর্তমান সরকারও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তথাকথিত সমঝোতা করে চলছে। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই নৈতিকতার দৃষ্টিকোন থেকে আমাদের সংবিধানের মূলনীতিসমূহ এবং বঙ্গঁবন্ধুর সরকার প্রবর্তিত উন্নয়ন নীতিকৌশলসমূহ আলোচনার প্রচেষ্টা নিয়েছি। আর তা করতে গিয়ে প্রবন্ধের ১ম অংশে মূলনীতিসমূহ আলোচনা করেছি ; দ্বিতীয় অংশে বঙ্গঁবন্ধুর সরকার প্রবর্তিত উন্নয়ন নীতি ও কৌশলসমূহ বঙ্গঁবন্ধু উত্তর সরকারসমূহের অনুরূপ নীতিকৌশলের সাথে তুলনা করার প্রয়াস নিয়েছি এবং সবশেষে বঙ্গঁবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে করণীয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

-I-

সুদীর্ঘ ২৪ বছরের ধারাবাহিক এক রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ১৯৭১ এর স্বশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আজকের বাংলাদেশকে পেয়েছি। এই আন্দোলন-সংগ্রামের মূল লক্ষ্যকে ধারণ করেই রচিত হয়েছিল আমাদের দেশের ১৯৭২ এর সংবিধান, যেখানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ চারটি নীতিকে বেছে নেয়া হয়েছে। সংবিধানে এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে :

১। **জাতীয়তাবাদ ঃ** "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।" (৪, পৃ ঃ ৪)।

২। **সমাজতন্ত্র ঃ** "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"

৩। **গণতন্ত্র ঃ** "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" (৪, পৃ ঃ ৪)।

৪। **ধর্মনিরপেক্ষতা** ঃ "ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য, ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।" (৪, পৃ ঃ ৪)।

উপরোক্ত চারটি মূলনীতির মধ্যে সরাসরি অর্থনীতি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এ নীতির বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করবে বাকী তিনটি। তার মানে সমাজতন্ত্র তথা শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি আবশ্যক, দরকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং ধর্মীয় হানাহানি ও উম্মাদনামুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ কাজটিই সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন তাঁর বাকশাল কর্মসূচীর মাধ্যমে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে, তিনি তা করতে পারেন নি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে। এরাই ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট তাঁকে স্বপরিবারে অত্যন্ত বর্বরভাবে হত্যা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিখাত বৃটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক হ্যারল্ড লাসকির ভক্ত। তিনি চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিকভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ

ঘটাতে, যেমন এখন লেটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বিশেষ করে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, নিকারাগুয়া ও উরুগুয়েতে ঘটছে।

আসলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলা হিসেবে বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন। আর তাই তিনি আন্দোলনের বছরগুলোতে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় অসংখ্যবার সোনার বাংলা শব্দগুচ্ছ উচ্চারণ করেছেন। সোনার বাংলা বলতে তিনি এমন এক বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা বুঝিয়েছেন যেখানে মানুষের ছয়টি মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়ন ঘটবে। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান। তিনি চেয়েছিলেন এদেশের মানুষ তিনবেলা পেটভরে ভাত খেতে পাক, ভাল পরিধেয় পাক, মাথাগোজার ঠাঁই পাক, পাক উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধা ও কাজ। এগুলোর বাস্তবায়নে তিনি বাকশাল কর্মসূচীর আওতায় তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন :
১। কৃষির সমবায়ীকরণ ; ২। আমদানী বিকল্প শিল্পায়ন ; ৩। ড: কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন। কৃষককে ভূ-স্বামী ও মধ্যসত্ত্বভোগীদের শোষণ থেকে মুক্ত করা ও কৃষির আধুনিকায়নের জন্যে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে দেশের ১২৫টি থানায় (বর্তমানে উপজেলা) বহুমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। ১৯৭৫ এর ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক কৃষক সমাবেশে তিনি বলেছিলেন : "কৃষক ভাইয়েরা আমার। আমি আপনাদের জমি নেব না। জমির মালিক আপনারাই থাকবেন। শুধু আধুনিক পদ্ধতিতে জমি চাষাবাদ হবে। সরকার ন্যায্য মূল্যে সকল উপকরণ ও সেচযন্ত্র সরবরাহ করবে। উৎপাদিত ফসল তিনভাগ হবে : মালিকানার জন্যে এক ভাগ, উপকরনের জন্যে এক ভাগ এবং শ্রমের জন্যে এক ভাগ।"

বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্ম সংস্থানের জন্যে শিল্পায়নের কোনও বিকল্প নেই। দেশকে স্বয়ম্ভর তথা আত্মনির্ভরশীল করা ও জনগণের চাহিদা পূরণের স্বার্থে তিনি আমদানী বিকল্প শিল্পনীতি বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর এ নীতি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ বিগত শতাব্দীর আশির দশকেই শিল্পায়ীত উন্নত দেশে রূপান্তারিত হতো এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায়। বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক কারিগরী, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়। তাই তিনি ড: কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে বিগত শতাব্দীর আশির দশকেই আমরা এ ক্ষেত্রে একটি নেতৃস্থানীয় দেশে পরিণত হতে পারতাম।

-II-

দুর্ভাগ্য আমাদের যে, আমরা জাতির পিতাকে বাঁচাতে পারিনি। ১৯৭৫ সালে তাঁকে হত্যার মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হয় যা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সাড়ে তিন বছরের শাসনামলের যাবতীয় অর্জনকে নষ্যাৎ করে দেয়া হয়, কাঁটা-ছেড়া করা হয় পবিত্র সংবিধানকেও। স্বৈর শাসক জেনারেল জিয়া সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে সেখানে সামাজিক ন্যায় বিচার বসিয়ে দেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে বিসমিল্লাহ বসিয়ে আমাদের সংবিধানের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র পাল্টিয়ে একে সাম্প্রদায়িক রূপ দান করেন। আমাদের দেশকে পাকিস্তানী ভাবাদর্শে ফিরিয়ে নেয়ার এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। শুধু তাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কুপরামর্শে বঙ্গবন্ধুর সরকার সূচিত বাকশাল কর্মসূচী বাতিল করে জিয়া সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এক ধরনের নব্য সামন্তবাদী অর্থনীতি চালু করেন। দেশে কায়েম করেন সিভিল-মিলিটারীর এক আমলাতন্ত্র। শুরু হয় তাদের অবাধ লুটপাট। দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়। ধ্বংস করা হয় সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

উপরে বর্ণিত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের কুপরামর্শে কাঠামোগত সংস্কারের নামে গোটা অর্থনীতি বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোকে তছনছ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রবর্তিত আমদানী বিকল্প শিল্পনীতি বাতিল করে চালু করা হয় রপ্তানীমুখী শিল্পনীতি। গড়ে তোলা শুরু হয় পোষাক শিল্প যার কাঁচামালসহ সবকিছুই তখন আমদানী করতে হতো। বস্তুতপক্ষে কাঠামোগত সংস্কারের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ। শুরু হয় বেসরকারীকরণ ও বেসরকারী খাতের বিকাশ উৎসাহিত করার নীতির বাস্তবায়ন। আমদানী বানিজ্যে উদারীকরণ করা হয় উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের স্বার্থে। ফলে দেশীয় শিল্পের বিকাশ অনেকটাই বাধাগ্রস্ত হয়। গড়ে ওঠে এক লাটি-ফুন্ডি চক্র যার অবধারিত পরিণতিতে ঋণখেলাপী সংস্কৃতি গড়ে উঠে। বাতিল করা হয় শিক্ষানীতি। স্বৈরাচার আজীবন ক্ষমতায় থাকার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী ধাঁচে ধর্মীয় শিক্ষা বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। মূল ধারার শিক্ষাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে এ সময়ে। দেশ জংগিবাদের লালন ক্ষেত্রে পরিণত হয় যার বিষময় ফল আমরা অদ্যাবদি ভোগ করছি। ভাগ্যিস মহাজোট সরকার ১৯৯৬ ও ২০০৮ এর নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে। তা না হলে দেশ আজ যে কোন্ অন্ধকারে ডুব দিত তা ভেবে সত্যিই আতংকিত হই আর কি!

স্বৈরাচারের আমলে একটি দু'বছর মেয়াদী এবং তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় বটে তবে তা যতটা না দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তারচেয়ে বেশী স্বৈরাচারের কল্যাণ ও খেয়াল-খুশিকে প্রাধান্য দিয়ে করা হয়েছে। একমাত্র প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে তথা সংবিধানের মূলনীতিসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে রচনা করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারের পতনের পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল

তারা তো পরিকল্পনাকে বিশ্ব মোড়লদের কুপরামর্শে একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। ফলে মহাজোট ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে কোনও পরিকল্পনা পায় নি। তাদেরকে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করতে হয়েছিল যার মেয়াদকাল ছিল ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। তবে এ পরিকল্পনায়ও সংবিধানের মূলনীতিসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়নি। ২০০১ এর নির্বাচনে বিশ দলীয় জোট ক্ষমতায় এসে আবার পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের কুপরামর্শে পিআরএসপি অথ্যাৎ দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্র প্রণয়ন করে যার বিষময় ফল দেশবাসী হারে হারে টের পেয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৎকালীন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা ঘুর্ণায়মান পরিকল্পনার কথা শিখেছিলাম। এর মানে হচ্ছে মন্ত্রণালয়গুলো স্ব-স্ব ক্ষেত্রের চাহিদা নিরূপণ করে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী তাদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দিবেন। এতে তাঁর মতে ভাল ফল পাওয়া যাবে। পরিাকল্পনার প্রয়োজন নেই। এর ফলে শাখা মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সম্পদের হিস্যা পাওয়ার জন্যে অসুস্থ এক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। কোন কোন মন্ত্রণালয় আবার অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর মহাআনুকুল্য পেতে সমর্থ হয়, অন্যরা এতে অস্বস্তিতে পড়ে। এতে করে প্রকৃত চাহিদা পাওয়া দুস্কর হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনীতিতে দেখা দেয় বিশৃংখলা। আসলেই পিআরএসপি যেসকল দেশ করেছে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। নেপাল, বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনাসহ আফ্রিকার বেশ কিছু দেশকে পিআরএসপি গিলিয়েছিল বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ।

স্বৈরাচার রেল ও নৌ-পথকে চরমভাবে অবহেলা করে আমাদের দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে দারুনভাবে বাধাগ্রস্ত করে। প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করে। এতে অন্তত: এক মিলিয়ন হেক্টর উৎকৃষ্ট আবাদী জমি নষ্ট হয়। অথচ রেলপথ ১৯৭২ সালের ২৮৭৪ কিলোমিটার থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ২৭০০ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায় ১৯৯০ সালে। ড্রেজিং এর অভাবে নৌপথ সংকুচিত হয়ে মাত্র ৩০০০ কিলোমিটারে গিয়ে দাঁড়ায় ঐ একই সময়ে। ঢাকায় পাতাল রেল নির্মাণের কথা চিন্তাও করেনি স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী। ঢাকাসহ সারা দেশে তাদেরই দলীয় লোকদের দ্বারা বাস সার্ভিস, ট্রাক সার্ভিস চালু করে। গড়ে উঠেছে এক মহানৈরাজ্যপূর্ণ বাস-ট্রাক সার্ভিস। ঘটছে দুর্ঘটনা। মরছে মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি। বেড়েছে দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট ব্যবসা।
অথচ যদি রেল ও নৌ-পথের উন্নয়ন করা হতো তা'হলে আমাদেরকে এই নৈরাজ্যপূর্ণ সেকেলে পরিবহণ ব্যবস্থা দেখতে হতো না, অর্থনীতি হতো অনেক অনেক গুণে দক্ষ।

আবাসনের নামে দখল ও জবরদখল হয়ে গেছে ঢাকার ৪৯টি খাল যাদের বেশীর ভাগের অস্তিত্বই এখন আর নেই। অথচ এগুলো ছিল ঢাকার জীবন। দখল হয়েছে খাস জমি, সরকারী উদ্যানের জমি ও নদ-নদীর পাড়। ঢাকা আজ এক কংকৃটের উদ্যানে পরিণত হয়েছে। এখানের বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা অনেক কম,

ক্ষতিকর সিসাসহ অসংখ্য ক্ষতিকর পদার্থে ভর্তি। আয়তনের অন্তত: ২৫% সড়ক থাকার কথা থাকলেও আছে মাত্র ৮%। সড়কসমূহ অত্যন্ত সরু ও সড়কের সংখ্যা কম হওয়ায় দীর্ঘ যানযট লেগেই থাকছে বিশেষ করে অফিস সময় শুরু ও শেষ হওয়ার মূহুর্তগুলোতে। আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর ও সেকেলে। সড়কসমূহের সিগনালিং ব্যবস্থা আরও খারাপ অবস্থায় আছে। ভাবা যায় এই একবিংশ শতাব্দিতেও হাত উঁচিয়ে সিগনালিং ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে।

মহাজোট সরকারের আমলে (২০০৯-বর্তমান) পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও আদর্শ অবস্থা থেকে এখনও অনেক দূরে আছে আমাদের দেশ। ২০০৮ এর নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় এসে এ সরকার আবার পরিকল্পনায় ফিরে যায়। এবারে তারা একটা নতুন ধরনের পরিকল্পনা করে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা "রূপকল্প ২০২১" এ নামে। এটি আবার দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে : ষষ্ঠ ও সপ্তম। ষষ্ঠ (২০১১-২০১৫) ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। বর্তমানে চলছে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)।

২০০৮ সালের নির্বাচনে মহাজোট সরকার তাদের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারকে "দিন বদলের সনদ" আখ্যা দিয়েছিল। তাদের দ্বিতীয় মেয়াদ চলছে, প্রায় শেষের দিকে। দিন যে বদল হয় নি তা বলছিনা। তবে একথা অবশ্যই বলতে পারি যে, দিন পুরোপুরি বদল হতে এখনও অনেক দূর যেতে হবে। টেকসইভাবে দারিদ্র্য উচ্ছেদ (এসডিজি'র ১ম লক্ষ্য), একমুখী শিক্ষা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, দুর্নীতি রোধ, দখল-জবরদখলের মত বিষয়গুলোর সুরাহা এখনও হয় নি। আমলাতন্ত্রের সমস্যা তো রয়েছেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সামনে সবচেয়ে বড় বাধা অবশ্যই আমলাতন্ত্র। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, সরকার আমলাতন্ত্রকে দায়িত্বশীল করার পরিবর্তে দায়মুক্তি ও আরও ক্ষমতাবান করতেই বেশী আগ্রহী। অফিস চলাকালীন সময়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম,ওয়ার্কসপ,বোর্ড সভা ইত্যাদিতে যোগদান কতখানি যুক্তিযুক্ত ওনৈতিক তা ভেবে দেখার সময় এসেছে বলে আমি মনে করি।

-III-

আমাদের দেশে বর্তমানে নৈতিকতার মহাসংকট চলছে। "চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী," বঙ্গবন্ধু এ বাক্যটি প্রায়ই উচ্চারণ করতেন অসাধু, দু:শ্চরিত্র ও গরীব-দু:খী মানুষের জন্যে প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের পণ্য ও টাকা-পয়সা আত্মসাতকারী দুষ্ট লোকদের ইঙ্গিত করে। নৈতিক স্খলন না ঘটলে একজন মানুষ আসলে অন্য একজন মানুষের হক কেড়ে নিতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে আমাদের জানা অত্যন্ত জরুরী আসলে নৈতিকতা কী ? নৈতিকতা বা নৈতিক দর্শন দর্শনেরই একটি শাখা যা মানুষের আচরণগত দিক নিয়ে আলোচনা করে। কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তার আচরণ বা কর্মকান্ড ঠিক না কি ভুল ,ভাল না কি খারাপ, পাপের না কি পুণ্যের , ন্যায্য না কি অন্যায় ইত্যাদির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নৈতিকতার বিশ্লেষণে। ঠিক তেমনিভাবে সরকারের আচরণ বা

কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করলেও এ বিষয়গুলো বেড়িয়ে আসে । আসলে নৈতিকতা হচ্ছে মানবিক আচরণ বা ব্যবহারের অন্য নাম । আর তাই তো আমরা দেখতে পাই যে, ধর্মের আর্বিভাব কিন্তু নৈতিকতার বাণী নিয়ে । খৃষ্টান , বৌদ্ধ , ইসলাম এমন কি হিন্দু ধর্মের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা বা মানবিক আচরণ শিক্ষা । সত্যিকার অর্থে অর্থনীতি হচ্ছে একটি নৈতিক বিজ্ঞান যা প্রায়োগিক দর্শনের একটি শাখা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে । তবে ধ্রুপদী যুগে এটি নৈতিক দর্শনের শাখা হিসেবে উঠে এলেও নব্য-ধ্রুপদী যুগে কিন্তু নৈতিকতার বিষয়গুলো অনেকটা ফিকে হয়ে যায়, অর্থাৎ প্রান্তিকীকরণ করা হয় । আধুনিক কালে এসে আবার নৈতিক বিবেচনাকে সাংঘাতিকভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে । যেমন নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের মতে,"অর্থনীতিবিদদের বেশী বেশী মনোযোগী হওয়া উচিত অর্থনৈতিক আচরণ বা কর্মকান্ড আলোচনায় নৈতিক বিষয়াবলীর প্রতি " (১৯৮৭) । বাংলাদেশের সংবিধানের প্রেক্ষিতে এবারে আমরা নৈতিকতার বিচারে আমাদের দেশের সরকারগুলোর কর্মকান্ডের একটা হিসেব কষার চেষ্টা করবো ।

১ । বঙ্গঁবন্ধুর সরকার সংবিধানের মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছিলেন । তিনি তাঁর বাকশাল কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি তথা দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা শেষ করে যেতে পারেন নি । সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে এ মহান কাজটি করতে দেয় নি । কারণ তারা ভয় পেয়েছিল যে, বঙ্গঁবন্ধু বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করে ফেলবেন । সাম্রাজ্যবাদীদের যত ভয় সমাজতন্ত্রকে । তাই তো তারা ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবকে নষ্যাৎ করার জন্যে বিপ্লবের ছয় মাসের মাথায় সদলবলে (প্রায় ১২টি পুঁজিবাদী দেশ সম্মিলিতভাবে) ঐ দেশটিকে আক্রমণ করে বসে এবং এর চার ভাগের তিন ভাগ দখল করে নেয় । মাত্র দেড় বছরের মাথায় লেনিনের নেতৃত্বে ঐ দেশটির জনগণ তাদেরকে ঝেটিয়ে বিদায় করেছিল এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিল । আসলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্রের মধ্যে তার জোমদূতকে দেখতে পায় । সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করলে তাদের শোষণের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাবে-এটাই তাদের বড় ভয় । এশিয়া,আফ্রিকা ও লেটিন আমেরিকার দেশগুলো অদ্যাবধি স্বাধীন হতো না যদি না পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটতো । এই তো সেদিন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকাকে জোর করে ধরে রেখেছিল তার হিরা ও সোনার লোভে । সেখানে কিউবার মত একটি ছোট্ট সমাজতান্ত্রিক দেশের কয়েক হাজার সৈন্যকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে । সাতাশ বছরের মত তারা দক্ষিণ আফ্রিকার মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে (মুদিবো) জেলে পুড়ে রেখেছিল । কারণ তিনি তাদের শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, কথা বলেছিলেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে । এই সাম্রাজ্যবাদীরাই দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় সংখ্যাগুরু মানুষগুলোকে যুগ যুগ ধরে সকল ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে

রেখেছিল। তারা বাস করতো ঘেট্টোতে (সংখ্যা লঘু শ্বেতকায়দের বসতি থেকে বেশ দূরে কৃষ্ণকায়দের জন্যে নির্মিত বস্তি ধরনের নিম্ন মানের বাসা বা কলোনী)। অথচ তাদেরকে বংশ পরম্পরায় কৃষি ও শিল্পসহ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশুর মত খাটাতো। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জনগণের মুক্তি যুদ্ধে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোই সাহায্যের (বস্তগত ও নৈতিক) হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল । আর কিউবানরা তো সরাসরি সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করেছিল। এটা না হলে কি পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা দক্ষিণ আফ্রিকার হিরা ও সোনার খনি ছেড়ে যেতেন আদৌ ?

আসলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো শত শত বছর ধরে ডাকাতের বেশে আজকের স্বাধীন অথচ পশ্চাদপদ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে লুণ্ঠন করে ধনী হয়েছে বিশেষ করে ব্রিটিশ, ফরাশী, ইতালীয়, স্পেনীয়, ডাচ, বেলজীয় ও পর্তুগীজরা। স্বাধীন হয়েও আজকের দিনে তারা আগাতে পারছে না। তার কারণ ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাধীনচেতা, গণতন্ত্রকামী নেতৃত্বকে গায়ের জোরে সচিয়ে দেয়, না সরলে চিরতরে পরকালে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে তারা আমাদের দেশের স্থপতি জাতির জনককে খুন করেছে, চিলির আলেন্দেকে, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণকে, ঘানার নক্রুমাকে এবং ভারতের ইন্দিরা গান্ধীসহ বিভিন্ন দেশের অসংখ্য গণতন্ত্রকামী নেতৃত্বকে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে। পিছিয়ে দিয়েছে এ দেশগুলোর অগ্রযাত্রাকে। আর পানামার সামরিক শাসক (প্রেসিডেন্ট) জেনারেল নরিয়েগাকে তো দস্তুরমত অত্যন্ত অমানবিকভাবে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহশনের বিচার করে ৪৮ বছরের দন্ড দিয়েছিল। এর কারণ হলো তিনি পানামা খাল পানামা বাসীর এই আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বিগত শতাব্দীর শুরুতে মার্কিনীরা পানামা খাল খনন করে দিয়েছিল বলে তার সমস্ত আয় ১০০ বছরের জন্যে তারা পাবে এই মর্মে এক নব্য দাসত্বের চুক্তি করতে পানামাকে বাধ্য করেছিল। কাজেই এর বিরুদ্ধে পানামাবাসীর আন্দোলন ছিল দীর্ঘদিনের।

ফিরে আসি আমাদের দেশের কথায়। সমাজতন্ত্রকে ভয় কেন ? তা'হলে বাহাত্তরের সংবিধানের মূলনীতিসহ সেই সংবিধান কেন ফিরিয়ে আনলেন ? আনলেন তো আনলেন, কিন্তু তাতে ১ম স্বৈরাচারের কুকীর্তির চিহ্ন রেখে দিলেন। ২য় স্বৈরাচারের রাষ্ট্র ধর্ম রেখে দিলেন। এটা তো ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে অবশ্যই সাংঘর্ষিক। মহামান্য হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারকরা এ ব্যাপারে নিরব কেন ? যৌক্তিকতা, ন্যায্যতা ও নৈতিকতার প্রশ্ন তো এখানে আসবেই যতদিন না উত্তরন ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে সবাই আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, তাঁর ভাষণ শুনি, ছবি দেখি, তাঁর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করি। কিন্তু কীভাবে তা হবে তা কি জানি আমরা ? জানলে তো হয়েছিল কাজ। ৬-৭% প্রবৃদ্ধি যে ডাবল ডিজিটে ওঠানো সম্ভব ছিল তা নিয়ে কি কেউ ভেবে দেখেছেন ? ভাবেন নি এবং অদূর ভবিষ্যতে ভাববেন বলেও মনে হয় না। চীনারা পারলো আর আমরা

পারলাম না। ওরা সংস্কার শুরু করেছিল ১৯৭৮ এ, আর আমরা বঙ্গবন্ধু উত্তর সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৫ এ। অবশ্যই দু'সংস্কারের মধ্যে গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য আছে বৈ কি ! আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের কুপরামর্শে রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহকে বাদ দিয়ে, অবজ্ঞা করে তথাকথিত কাঠামোগত সংস্কারের নামে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতকে ধ্বংস করা হয়েছিল, দুর্বল করা হয়েছিল। ছিল না আমাদের দক্ষ জনশক্তি। অথচ চীনের ছিল শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাত (এখনও আছে)। সর্বোপরি চীনের ছিল অত্যন্ত দক্ষ ও দেশপ্রেমী জনশক্তি যা তৈরী করেছিল সমাজতন্ত্র। সেই ১৯৪৯ সালের বিপ্লব পরবর্তী সময় থেকে তারা এ কাজটি করেছিল (জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা)।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, আমাদের শাসকগোষ্ঠী সমাজতন্ত্র কথাটি ভুলেই গেছেন, অথবা লজ্জাবোধ করেন সমাজতন্ত্র কথাটি উচ্চারণ করতে। অন্য তিনটি মৌলিক নীতি যথাক্রমে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা কালে-ভদ্রে উচ্চারণ করলেও সমাজতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। যৌক্তিক প্রশ্ন : মাথা ছাড়া কি ধরের অস্তিত্ব আছে, না আদৌ থাকতে পারে ? একইভাবে সমাজতন্ত্র ছাড়া কি মৌলনীতির কথা বলা যায়, না সম্ভব ? মনে রাখতে হবে যে, স্লোগান, আর বক্তৃতা করে সোনার বাংলা গড়া যাবে না। সোনার বাংলা গড়তে হলে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের পথে আসতে হবে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের পথে আসতে হবে। তবে অবশ্যই গণতান্ত্রিকভাবে তা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু সংসদের মাধ্যমে পরিবর্তন এনেছিলেন, রক্তাক্ত কোন পথে নয়। আমার কথা হলো হয় বাস্তবায়ন করুন না হয় সংবিধান পুন:সংশোধন করে তা বাদ দিয়ে দিন। এত বড় বিজয় নিয়ে ভয় কিসের ও কাকে? খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলার চেয়ে না চলাই উত্তম।

২। মালিকানার নীতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় খাতের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে, উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে ঃ

"ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ;

খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের মালিকানা ; এবং

গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।" (৪,পৃ ঃ ৫)।

দেখা যাচ্ছে যে, সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, আমাদের দেশে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় খাত থাকবে। এ খাত হবে গতিশীল, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হবে। বঙ্গবন্ধু এ খাতের শুভ সূচনা করেছিলেন ১৯৭২ সালে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণের মাধ্যমে। অথচ বঙ্গবন্ধু উত্তর সামরিক স্বৈরাচার সাম্রাজ্যবাদীদের কথামত ক্রমান্বয়ে পরিকল্পিতভাবে সরকারী খাতকে দুর্বল করার নীতি গ্রহণ করে। তথাকথিত

বেসরকারীকরণ নীতির আওতায় তারা ভাল ভাল লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারীকরণ করলেও লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারীকরণ তো করে-ই নি, সরকারী খাতে রেখে আধুনিকায়নের মাধ্যমে পরিচালনারও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আসলে আমাদের দেশের বেসরকারী খাতের উদ্যেক্তারা লাভজনকভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো চালানোর পরিবর্তে এগুলোর জমি, যন্ত্রপাতি বিক্রি করে, ধনী হওয়ার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এটা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি এবং অনৈতিক কাজ। তারা এভাবে অর্জন করা টাকা নতুন আরও বেশী লাভজনক খাতে বিশেষ করে পোষাক শিল্প, রিয়েল ষ্টেট, পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যাংক-বীমা গড়ে তোলার কাজে বিনিয়োগ করে। সরকার তাদেরকে এ কাজে অনৈতিকভাবে সহযোগিতা করে। ফলে রাষ্ট্রীয় খাত অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে এাবং বেসরকারী খাত শক্তিশালী হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের বেসরকারী খাত সরকারী খাতের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠে। এমনিতে কি আর আশির দশকে সরকারী ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ খেলাপী হয়। আমরা জানি তাদের এ ঋণ অবলেপন করা হয়েছে। কত বড় অনৈতিক কাজ ! জনগণের টাকা টাউট বাটপারদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। সরকার লাভজনকভাবে সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে চালানোর কোনও উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবাধে লুট-পাটের সুযোগ করে দিয়ে স্বৈরাচার নিজেদের আখের গুছিয়েছে ঃ গড়ে তুলেছে নিজস্ব ব্রান্ডের রাজনৈতিক দল, ব্যবসা-বানিজ্য ইত্যাদি। শুরু হয় নেতা ক্রয়-বিক্রয়ের অপ-রাজনীতি যা সৎ, ত্যাগী ও দেশ প্রেমী রাজনীতির বিকাশকে চরমভাবে বাঁধাগ্রস্ত করে। স্বৈরাচারের পতনের পরও এ ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৯৬ এর নির্বাচনে মহাজোট ক্ষমতায় আসার ফলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও, আবার ২০০১ এর নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় এসে তাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাতিল করে দেয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে মহাজোট পুনরায় ক্ষমতায় এসে পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বেসরকারীকরণকৃত বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক পুনরায় সরকারী খাতে নিয়ে নেয় নানা অনিয়মের অভিযোগে। নির্বাচনী ইশতেহার মোতাবেক তারা বন্ধ বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক পুনরায় চালু করে। তবে বেসরকারী খাতকে বেশী বেশী সুবিধা দেয়ার কাজটি এরাও পূর্বের ন্যায় অব্যাহত রাখে। অথচ সংবিধানে বলা আছে রাষ্ট্রীয় খাতকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় খাতকে কেন গুরুত্ব দিতে হবে তা একটি ছোট্ট অথচ অত্যন্ত গুরুত্ববাহী উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি। ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে তৎকলীন বিরোধী দলের জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনের সময় যদি রাষ্ট্রায়ত্ব পরিবহণ ব্যবস্থা রেলপথ সচল না থাকতো তা'হলে রাজধানী ঢাকার সাথে গোটা বাংলাদেশের যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে সমর্থ হতো বিরোধী দল। কারণ সমস্ত অন্যান্য পরিবহণ সংস্থার মালিক তাদেরই সমর্থক লুটেরা গোষ্ঠী। আসলে শক্তিশালী রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের উপস্থিতি আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত জরুরী। কারণ এটা বেসরকারী খাত কর্তৃক জনগণকে তথা দেশকে

জিম্মি করার বিরুদ্ধে একটা মহাপ্রতিশোধক (Great Deterent) হিসেবে কাজ করে উপরোক্ত উদাহরণ তার প্রমাণ।

৩। আমাদের সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির বিষয়ে। এর দ্বিতীয় ভাগের ১৪-শ ধারায় বলা আছে : " রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা ।" (৪,পৃ ঃ ৫)। এ কাজটা থেকে যে আমাদের দেশ বহু দূরে অবস্থান করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বল্প বেতন, বেতন বাকী রাখা, গুন্ডা দিয়ে দৈহিক ও মানষিক নির্যাতন ইত্যাদি বেসরকারী খাতের শিল্পসমূহে বিশেষ করে পোষাক শিল্পে এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেজন্যে মাঝে মাঝেই এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসছে, ভাংচুর করছে। সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানেও বিশেষ করে পাট শিল্পে মাঝে মধ্যেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। আর জনগণের অনগ্রসর অংশের মধ্যে বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় তো অস্বস্তিকর

পরিস্থিতি লেগেই আছে। জীবনযাত্রার মানের সূচকের সাথে সংগতি রেখে বেতনভাতাসহ সকল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে - এটাই আন্তর্জাতিক নিয়ম। অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারী খাতের মালিকরা এটা করে না বলেই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সরকার এর নৈতিক দায়িত্ব এরাতে পারে না জন্যে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। চীনে এরকম ব্যবস্থাই আছে। যেকারণে সেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আছে।

৪। মৌলিক চাহিদা বা অধিকার পূরণের ব্যাপারে সংবিধানে বলা হয়েছে : "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ;

খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গঁত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;

গ) যুক্তিসঙ্গঁত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার ; এবং

ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুঁত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।" (৪,পৃ ঃ ৫)।

স্বাধীনতার ৪৬ বছরে মৌলিক অধিকারগুলোর কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে বটে ; তবে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে আছি আমরা। আমরা কি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, প্রতিটি মানুষ তিনবেলা পেট ভরে ভাত ক্ষেতে পারছে ? পারি কি বলতে যে, সবাই ভাল বস্ত্র পাচ্ছে, মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে সকলের, শিক্ষা পাচ্ছে সবাই, প্রত্যেকে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে, এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে ? নি:সন্দেহে এর একমাত্র উত্তর হবে : না, পারি না। সবাইকে কি সরকার কর্ম দিতে পেরেছে ? এটা পারলে তো বাকী মৌলিক অধিকারগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যেত। এখনও যখন খোদ রাজধানী ঢাকা শহরের আনাচে-কানাচে ভিক্ষুকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, গাড়ীর চারদিকে (সিগনালে) ভিক্ষুক ও ফেরিওয়ালার ভীড় জমে জীবন বাজী রেখে, যখন দেখি ছিন্নমূল শিশু-কিশোররা ডাষ্টবিন ও আবর্জনার স্তুপে জীবিকার সন্ধান করছে, বাসের কন্ডাকটর সুপারভাইজার ও হেলপারদের কথা নাই বা বললাম। এদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম দেখলে মনটা বিষাদে ভড়ে ওঠে এবং মনে একটা প্রশ্নেরই উদয় হয় ; কবে হবে আমাদের দেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা যেখানে মানুষের উপরোক্ত দু:খ আর দেখতে হবে না। বর্তমানে যেভাবে চলছে তাতে আদৌ হবে অন্তত: আমাদের জীবদ্দশায় সে ভরসা পাচ্ছি না। যাই হোক সোনার বাংলা তো আর মুখের বানী বা স্লোগান নয়। তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী কিছু।

কর্মের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে সংবিধানে। কর্ম কি আছে ? কর্ম সোনার হরিণ। সরকারী চাকুরীসহ যেকোন চাকুরীর বিজ্ঞাপন দিলে পদসংখ্যার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশী আবেদন পড়ে। অতি ভাগ্যবান কয়েকজন পায়, বেশীর ভাগই পায়না, যারা পায়না তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কেহ কেহ আবার পরকালের পথ বেছে নেয়। এ দৃশ্য আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে এই স্বাধীন বাংলাদেশে। অন্যদের কথা বাদ দিলাম বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা, অথচ বেকার-এদের সংখ্যা লক্ষাধিক। এই কিশোর-কিশোরীরা, যুবক-যুবতীরা কত অবদান রাখতে পারতো দেশ গড়ার কাজে, অথচ ঠায় অপচয় হচ্ছে তাদের শক্তি ও মেধা। এরাই তো সমাজের সবচেয়ে দেশপ্রেমী যুবশক্তি। এটা আমাদের দেশের পরিচালকদের অনুধাবন করতে হবে, বুঝতে হবে।

কর্মই যেখানে নেই বা অপ্রতুল প্রয়োজনের তুলনায়, সেখানে বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের কথা না বলাই শ্রেয়। ওগুলোতে শুধুই বিত্তবানদের অধিকার। আর তা অত্যন্ত ভালভাবেই বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। এভাবে কি বৈষম্যহীন ও সমতার বাংলাদেশ গড়া যাবে ?

সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে সংবিধানে। সামান্য কিছু টাকা-পয়সা (প্রয়োজনের তুলনায় সাগরে জলকনার মত) দিলেই কি নিরাপদ জীবনযাপন সম্ভব অসহায় মানুষগুলোর পক্ষে ?

৫ । অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র সংবিধানে বলা হচ্ছে : "রাষ্ট্র, ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য ; খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গঁতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য ; গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য ; কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।" (৪,পৃ ঃ ৫) ।

৪৬ বছর বয়সী একটি দেশ এখন অবদি দেশকে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারে নি । এ দু:খ রাখি কোথায় ? ধর্ম শিক্ষা যেখানে প্রাধান্য পেয়ে আসছে, সেখানে গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা হবে কীভাবে ? প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির আকুতি সেখানে অরণ্যে রোদনের মতই শোনায় । আর দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করবার ওয়াদা যে কতবার ভঙ্গঁ হয়েছে তা এ মূহুর্তে আমার মনে পড়ছে না । দেশের সিংহভাগ মানুষকে অক্ষরজ্ঞানহীন রেছে আর যা-ই হোক সোনার বাংলার কথা ভাবা যায় না ।

সুযোগের সমতা প্রসঙ্গেঁ সংবিধানে লেখা আছে : " ১৯ । ১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন ।

২ । মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ–সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

৩ । জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন ।" (৪,পৃ ঃ৬) ।

আসলে সমতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ, সুষম উন্নয়ন এ ধরনের শব্দগুচ্ছ আমাদের অভিধান থেকে কবে যে বিদায় নিয়েছে আমাদের অজানতে তা আমরা টেরও পাইনি । আর মহিলাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি হলেও সুযোগের সমতার কথা বলার সময় এখনও আসেনি ।

ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সংবিধানে বলা হয়েছে : " ২০ ।১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবাং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী" - এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন । ২ । রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্ট করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ

হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক- সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।" (৪,পৃ ঃ ৬)।

এ ক্ষেত্রে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না : প্রত্যেক সামর্থ্যবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ কি কাজ পাচ্ছে ? যারা পাচ্ছে তারা সবাই কি যোগ্যতার নিরিখে পাচ্ছে ? দুর্নীতি কি নিয়মে পরিণত হয়নি নিয়োগের ক্ষেত্রগুলোতে ? দুর্নীতির মাধ্যসে যোগ্যদের হটিয়ে অযোগ্যরা নিয়োগ পেলে সমাজে সৃজনশীলতা ধ্বংস হয়ে যায়, সমাজ মানষিকভাবে দরিদ্র হতে বাধ্য হয়। আর অনুপার্জিত আয়ের প্রসঙ্গেঁ শুধু একটি কথা বলা-ই যথেষ্ট হবে : আমার মনে হচ্ছে আমাদের সমাজে উপার্জিত আয়ের (সৎ আয়) চেয়ে অনুপার্জিত (অসৎ আয়) আয়-ই বেশী। মাঝে মধ্যে দু'একজন এরকম অনুপার্জিত আয়ের মালিক ধরা পড়লে আমরা জানতে পারি তার সৎ আয়ের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী অসৎ আয়। রাষ্ট্র কি এ অনৈতিক প্রক্রিয়া চিরতরে বন্ধ করতে প্রচেষ্টা নিয়েছে ? ভবিষ্যতে নিবে ? এ রকম অন্যায়, অন্যায্য ও অনৈতিক কর্মকান্ড বিদ্যমান রেখে সোনার বাংলা বিনির্মাণ কি আদৌ সম্ভব ? এ প্রশ্ন রাখছি রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের কাছে।

৫। নাগরিক ও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সংবিধানে পরিস্কারভাবে বলা আছে: "২১।১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃংখলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। ২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" (৪ পৃ: ৬)।

জনগণের একটা বড় অংশই অজ্ঞতাবসত আইন অমান্যের মত শাস্তিযোগ্য অন্যায় আচরণ করে থাকে। জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনগণকে ভালভাবে অবগত করা । প্রশ্ন হচ্ছে : তারা এ দায়িত্বটি কি আদৌ পালন করেন ? ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। কিন্তু তাদের সংখ্যা কতজন ? অতি নগণ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই একটি কথা স্পষ্টভাবে উচ্চরণ করেই চলেছেন : "সরকার জনগণের সেবক, শাসক নয়"। আমলাতন্ত্র কি তাঁর কথা আদৌ শোনেন ? শুনলে তো ফাইল আটকে থাকার কথা নয়। ফাইল রেখে সেমিনার-ওয়ার্কসপ, অন্যত্র সভা ইত্যাদি করলে তো প্রকল্পে দেরী হবেই। ফাইল আটকে রেখে যদি ঘুষ চাওয়া হয় তাহলে তো কথাই নেই। সর্বনাশ হবেই। আর ক্ষমতা দেখানোর মানষিকতা তো ভয়ংকর গোটা সামাজের জন্য, ব্যক্তির জন্যে। এই তো সেদিনের ঘটনা : খোদ রাজধানী শহরের বুকে স্কুলে ঢোকা নিয়ে মেজিষ্ট্রেট ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জোনের মধ্যে হাতা-হাতি, মারা-মারি। অত:পর মেজিষ্ট্রেট মহোদয় মামলা দিয়ে বুড়ো ডাক্তারকে কিনা জেলে পাঠিয়ে দিলেন। অন্যদিকে বিআইডবলিউটিএ'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় তো দুদকের কর্মকর্তার কাছে ঘুষ নেয়ার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়লেন। এরকম

অসংখ্য ঘটনা ঘটছে যার অতি সামান্যই আমরা দেখতে পারছি। জানতে পারছি। সরকারকে এগুলো চিরতরে বন্ধ করতে হবে। কঠোর শাস্তির জন্যে বিধি-বিধান প্রয়োজনে ঢেলে সাজাতে হবে। জিরো টলারেন্সে যেতে হবে। ব্যাংকে অনিয়ম করে দুর্নীতি করে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পার পেলে তো দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে যাবে। সরকার কি তা চায় ? নৈতিকতা, ন্যায্যতায় আস্থা রাখলে ভাল। অন্যথায় সোনার বাংলা বিনির্মাণ হবে না।

৬। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রশ্নে আমাদের সংবিধানে লেখা হয়েছে : " ২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গঁ সমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।" (৪,পৃ ঃ ৬)

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা " নিশ্চিত করিবেন"। প্রশ্ন হচ্ছে : রাষ্ট্র কি তা করেছেন ? করবেন বলে মনে হয় ? তা যদি না হয়, তা'হলে প্রশাসনযন্ত্রের সাথে বিচারবিভাগের দ্বন্দে অধ:স্তন আদালতগুলোর শৃংখলা বিধি নিয়ে গেজেট প্রকাশে এতবার সময় নেয়ার মত তাল বাহানা করাটা হতো না। প্রধানমন্ত্রী সঠিকভাবে বলেছেন : রাষ্ট্রের তিন বিভাগের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সমঝোতার মনোভাব থাকতে হবে। সবাই স্বার্বভৌম। কেউ কারো অধিনস্ত নয়। পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতার মনোভাব এবং সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে কাজ না করলে সোনার বাংলা বিনির্মাণ অসম্ভব।

- IV -

উন্নয়ন কর্মকান্ড হতে হবে সমন্বিত। আগেরটা আগে করতে হবে। আর পরেরটা পরে। আমাদের দেশে প্রায়সই এর ঠিক উল্টোটা হচ্ছে। উদাহরণ : আগে রেল ও নৌ-পথের উন্নয়ন না শিল্প-কারখানা গড়ে তুলবো। নিশ্চয়ই রেল ও নৌ-পথ এবং বিদ্যুতের কারখানা। এমন ঘটনার কথা আমরা প্রায়ই শুনি যে, কারখানা হয়ে গেছে, বাড়ী হয়ে গেছে, কিন্তু গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে : উন্নয়নটা হতে হবে টেক্সই। একবার হয়ে থেমে গেলে চলবে না। উদাহরণ : এবারের হাওরের বাধে ধ্বস! অমনি বন্যা। অমনি ১০ লাখ টন চালের ঘাটতি। অমনি চাল আমদানী ! এর আগে চাল রপ্তানীর মত প্রহশনও হতে দেখলাম আমরা। এটাকে কি টেক্সই উন্নয়ন বলবো আমরা ? নৈতিকতা কি বলে ? বাধ কি পুন:নির্মাণ হয়েছে ? এপ্রিলের আর কয়মাস বাকী ? বাধটা কি আরও এক মিটার উঁচু করা যায় না ? শাস্তি কি পেয়েছে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজরা ? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া জরুরী। ব্যবস্থা নিতেই হবে এবং তা হবে অতি কঠোর, কঠোরতম। কারণ বিষয়টি সোনার বাংলা বিনির্মাণের সাথে ওৎপ্রোৎভাবে সংশ্লিষ্ট।

দুর্নীতি সর্বত্র। টাকা ছাড়া কোনও কাজই হয় না। এটা জনগণের কথা। লাইসেন্স, পাসপোর্ট থেকে আরম্ভ করে গ্যাস-বিদ্যুত-পানি-টেলিফোনের সংযোগ, নকসা অনুমোদনসহ সবকিছুতেই অবৈধ টাকার লেন-দেন।

আর নিয়োগ-বানিজ্য এখন অভিধানে নতুন শব্দ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এই ডিজিটাল যুগে আবার নতুন ধরনের প্রতারণা, অবৈধ লেনদেন ও ডিজিটাল কারচুপির কথাও শোনা যাচ্ছে। সকল ধরনের প্রতারণা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে। শিথিলতার কোনও স্থান হবে না এখানে। প্রয়োজনে নতুন আরও কঠোর আইন করুন এবং নির্দয়ভাবে ব্যবস্থা নিন। কাজ শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকে। পারবেন কি বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা?

বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপে কাজ হবে না। কাজ হতে হবে নিরবিচ্ছিন্ন, সুসমন্বিত। ক্ষুদ্র-বড় সকল প্রকার গাফিলতিতে জবাবদিহিতা থাকতে হবে। একমাত্র এটা নিশ্চিত করতে পারলেই বৈষম্যমুক্ত, সমতাধর্মী সমাজ তথা সমাজতন্ত্র তথা জাতির জনকের স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণ বাস্তবরূপ লাভ করবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Planning Commission, GOB, The 7th Five Year Plan FY 2016-FY 2020,Dhaka, 2015

২। BBS, MOP, Statistical Year Book Bangladesh 2015, Dhaka.

৩। BBS, MOP, Year Book of Agricultural Statistics 2015, Dhaka, 2016.

৪। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা ২০১১।

৫। বারকাত আবুল, অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য, মুক্তিবুদ্ধি, ঢাকা ২০১৭ ।

৬। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বাজেট প্রস্তাবনা ২০১৬-২০১৭।

৭। খান মো : মোয়াজ্জেম হোসেন, বাংলাদেশে উন্নয়ন ভাবনা : তত্ত্ব ও বাস্তবতা, Bangladesh Journal of Political Economy , Vol. 31, No. 3.

৮। বারকাত আবুল, বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক : সমাধানে সংস্কার নয়, প্রয়োজন অমূল পরিবর্তন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জাতীয় সেমিনার ২০১৫ তে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

৯। সেন অমর্ত্য, নীতি ও ন্যায্যতা, আনন্দ প্রকাশন, ২০১৩ ।

১০। দৈনিক প্রথম আলো।

১১। দৈনিক সমকাল।

১২। The Daily Star.